শ্রীশ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

জৈবধর্মের মুখ্য মুখ্য কয়েকটি প্রশ্ন

(১ম অধ্যায় থেকে ১২ তম অধ্যায় পর্যন্ত)

১। বস্তু বলতে কি বোঝায়? বস্তুর ধর্ম কি ? বাস্তব বস্তু বলতে কাকে বলে ? (পুরানো বই—৬-৭ পৃঃ)

উঃ) 'বস্' ধাতু 'তু' প্রত্যয়যোগে 'বস্তু' শব্দ নিষ্পন্ন হয় অর্থাৎ যাহার অস্তিত্ব বা প্রতীতি আছে তাকে 'বস্তু' বলা হয়। বস্তু দুইপ্রকার। যথা—বাস্তব বস্তু ও অবাস্তব বস্তু।

বস্তুর যেটা নিত্যস্বভাব সেটা বস্তুর ধর্ম । যেমন—জলের স্বভাব তারল্য । তরলতাই জলের ধর্ম্ম। তদ্রুপ জীব কৃষ্ণের অংশ। অংশী কৃষ্ণের সেবাই জীবের ধর্ম্ম।

বাস্তব বস্তু—যার নিত্য অস্তিত্ব বা প্রতীতি আছে, তা বাস্তব বস্তু। বাস্তব বস্তু পরমার্থভুত তত্ত্ব। শ্রীমদ্ভাগবতে " বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদম্ (ভাঃ—১।১।২) শ্লোকে 'বাস্তব বস্তু' বলতে ভগবানকে নির্দেশ করা হয়েছে। সেই বস্তুর পৃথক অংশ জীব ও শক্তি মায়া। অতএব 'বস্তু' শব্দে ভগবান, জীব এবং মায়া—এই তিন তত্ত্বকে বুঝতে হবে ।

২। জীবের নিত্য ধর্ম কি ? বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে উহার পার্থক্য কোথায় ? (পুরানো বই—১০ পৃঃ)

উঃ) ঈশ্বরের ইচ্ছায় যখন কোন বস্তু গঠিত হয় তখন সেই বস্তুর গঠনের সঙ্গী হিসাবে তার একটি নিত্য স্বভাব দেখা যায়, সেই স্বভাবই উক্ত বস্তুর নিত্য ধর্ম। । জীব ভগবানের অংশ ও অণুচিৎ বস্তু । চেতনতাই তার স্বভাব । তার প্রকৃত স্বরূপ কৃষ্ণ নিত্যদাস। প্রেমই তার ধর্ম। কৃষ্ণদাস্যই বিমল প্রেম। অতএব কৃষ্ণদাস্যরূপ প্রেমই জীবের নিত্য ধর্ম। প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণবধর্মের সাথে জীবের নিত্যধর্মের কোন পার্থক্য নেই । স্বরূপতঃ সকল জীবই কৃষ্ণের অংশ । অতএব কৃষ্ণের সেবা তথা চিদানুশীলনই জীবের নিত্য ধর্ম । জীবের শুদ্ধাবস্থায় সেটা প্রকাশ পায়। নিত্যধর্ম শুদ্ধ, পূর্ণ ও সনাতন। এই নিত্য ধর্মের নামান্তর বৈষ্ণবধর্ম।

৩। নৈমিত্তিক ধর্ম বলতে কি বোঝায় ? নিত্য ধর্মের সঙ্গে উহার পার্থক্য কি ? (পুরানো বই—২৫ পৃঃ)

উঃ) ঈশ্বরের ইচ্ছায় যখন কোন বস্তু গঠিত হয় তখন সেই বস্তুর গঠনের সঙ্গী হিসাবে একটি নিত্য স্বভাব দেখা যায়, সেই স্বভাবই উক্ত বস্তুর নিত্য ধর্ম। কিন্তু অবস্থাভেদে সেই স্বভাব বা ধর্মের পরিবর্ত্তন হয় যা নিত্যধর্মের ন্যায় দৃষ্ট হয়, তখন সেই ধর্মকে নৈমিত্তিক ধর্ম বলে। জীব ভগবানের অংশ। অংশী ভগবানের সেবা করাই তার নিত্য ধর্ম। কিন্তু হরিবিস্মৃতি ক্রমে নিত্য স্বরূপ ধর্মের যে বিপর্যয় ঘটে, তার ফলে যে সমস্ত অনিত্য ধর্মের উদ্ভব হয় । এটাই তার নৈমিত্তিক ধর্ম।

নিত্য ধর্ম জীবের শুদ্ধাবস্থায় প্রকাশ পায়, আর নৈমিত্তিক ধর্ম বদ্ধাবস্থায় থাকে। নিত্যধর্ম শুদ্ধ, পূর্ণ ও সনাতন, নৈমিত্তিক ধর্ম তাৎকালিক বা ক্ষণিক। নিমিত্ত দুরীভুত হলে এই ধর্ম লোপ পায়। নিত্যধর্মে বিমল প্রেমদ্বারা কৃষ্ণদাস্য লাভ করবার যত্ন আছে । নৈমিত্তিক ধর্মে ঈশ্বর ও আত্মার নিত্বত্বের স্বীকার আছে কিন্তু অনিত্য উপায় দ্বারা ঈশ্বর প্রসাদ লাভ করবার চেষ্টা রয়েছে।

৪। জীব ও ঈশ্বরের ভেদাভেদ সম্বন্ধ কি ? (পুরানো বই—৭ পৃঃ)

উঃ) জীব চিৎধর্ম্মী হয়েও গঠনগত কারণে মায়া বশীভুত হবার যোগ্য। আবার তটস্থাশক্তির পরিণাম হওয়ায় ভগবানের সঙ্গে তার নিত্য ভেদ ও অভেদ সম্বন্ধ বর্ত্তমান। ভগবান বিভুচিৎ ও জীব চিৎকণ ।সুতরাং চেতনধর্মে অভেদত্ব দেখা যায়। কিন্তু পূর্ণতা ও অপূর্ণতা ভেদে উভয়ের স্বভাব ভেদ দেখা যায়। যেমন—কৃষ্ণ প্রভু, জীব তাঁর নিত্যদাস । কৃষ্ণ আকর্ষক, জীব আকৃষ্ট । কৃষ্ণ ঈশ্বর, জীব ঈশিতব্য । কৃষ্ণ দ্রষ্টা, জীব দৃষ্ট । কৃষ্ণ সর্বশক্তিমান, জীব নিঃশক্তিক।

৫। শঙ্করাচার্য প্রচারিত ব্রহ্মবাদ বা মায়াবাদ কিরূপ ? বৈষ্ণব ধর্মে উহার প্রভাব কি ? (পুরানো বই—১১-১২ পৃঃ)

উঃ) বেদে যে পশুহত্যার বিধান দেওয়া আছে তাকে বিকৃত করে জগতে উগ্র তামসিক ভাবাপন্ন লোক যথেচ্ছভাবে পশুহত্যা শুরু করে, যার ফলে হিংসা বৃত্তি ছড়িয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় বুদ্ধদেব এসে অহিংসা পরম ধর্ম এইমত প্রচার করায় হিংসা প্রবৃত্তি কিছুটা প্রশমিত হলেও বেদকে না মানার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। সমাজে বিরাট অসুবিধার সৃষ্টি হয়। তখন ভগবানের আদেশে শিবাবতার শঙ্করাচার্য বেদের মানত্যা স্থাপনের উদ্দেশ্যে একদেশিক মতবাদকে জগতে প্রতিষ্ঠা করেন । তাঁর মতে জীব ব্রহ্ম, এটাই তাত্ত্বিক বুদ্ধি কিন্তু সে যখন মায়ার অধ্যাস বশতঃ 'আমি জীব' এই অভিমান করে, এটাই শঙ্করের বিবর্ত্তবাদ।তাই শঙ্করাচার্যের বিবর্ত্তবাদ অদ্বৈতবাদের অন্তর্গত হলেও ইহা অবিশুদ্ধ এবং ইহার অপর নাম মায়াবাদ, এটি ভগবানের নির্দেশে কালোপযোগী ব্যবস্থা ছিল। বেদের একদেশিক মতবাদ

শঙ্করাচার্য্য প্রচার করেছেন। বেদের মুখ্য তাৎপর্য্যকে (অভিধা বৃত্তিকে) গোপন করে গৌণ তাৎপর্য্যে (লক্ষণা বৃত্তিতে) এই মতবাদ সৃষ্টি করেন।

বৈষ্ণব ধর্মে উহার প্রভাব—

১। শঙ্করাচার্যের মতবাদ ফলে বেদের মান্যতা জগতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

২। এই মতবাদের উপর ভিত্তি করে পরবর্ত্তীকালে চার আচার্য বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্মের সৌধ নির্মাণ করেছেন।

৩। হরিভজন দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ও মুক্তিলাভ—শঙ্করাচার্যের শিক্ষা।

৬। বেদের বাস্তব তাৎপর্য কি ? গৌণ তাৎপর্যে বেদের অন্যান্য নির্দেশ বর্ণন করুন ?(পুরানো বই—৪৭ পৃঃ)

উঃ) বেদ সৃষ্টি হয়েছে ভগবানের সৃষ্টি লীলাকে সুষ্টুভাবে পরিচালনা করবার জন্য। বেদ সমাজের সকল শ্রেণীর মানবের জন্য কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য বিচার দেখান। কর্মী, জ্ঞানী, যোগী, বর্ণাশ্রমী সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য বেদ। সেখানে কর্মাঙ্গের কথা, জ্ঞানমার্গের কথা, বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করে চিত্তশুদ্ধি পর্যায়ক্রমে বিষ্ণুভক্তি লাভের কথা রয়েছে। মুখ্য তাৎপর্যে বেদ হরিভজনের কথা বলে। হরিভজনে রুচি উৎপন্ন করাই বেদের বাস্তব ফল। মুখ্য তাৎপর্যে বেদ বলেন

বেদশাস্ত্র কহে—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন।

কৃষ্ণ—প্রাপ্য সম্বন্ধ, ভক্তি—প্রাপ্যের প্রয়োজন।

অভিধেয় নাম ভক্তি, প্রেম প্রয়োজন।

পুরুষার্থ শিরোমণি প্রেম মহাধন ।। (চৈঃ চঃ মঃ—২০।১২৪-১২৫)

বেদ গৌণ তাৎপর্যে কর্মীদের ভুক্তি, জ্ঞানীদের মুক্তি ও যোগীদের সিদ্ধির কথা উপদেশ করেছেন। কর্মীদের কর্মাঙ্গে কৃষ্ণপূজায় চিত্তশুদ্ধি, মুক্তি ও রোগশান্তি। কর্মীদের একাদশী ব্রতে পাপ নাশ। যজ্ঞের উদ্দেশ্যে পশুহত্যার বিধান, সন্ধ্যা-বন্দনাদি, অষ্টাঙ্গ যোগ, বর্ণাশ্রম ধর্ম পালনাদি দ্বারা জীবকে প্রবৃত্তি মার্গ থেকে নিবৃত্তি মার্গে নিয়ে যাবার যাওয়ায় বেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

৭। শাস্ত্রে ফলশ্রুতিমূলক কথার উল্লেখ কেন ? (পুরানো বই—৪৭ পৃঃ)

উঃ) জগতে দুইপ্রকার মানুষ দেখা যায়। উদিত বিবেক ও অনুদিত বিবেক। অনুদিত বিবেক ব্যক্তিগণ একটা উপস্থিত ফল না দেখলে কোন সৎ কাজ করে না, তাদের জন্যই শাস্ত্রে ফলশ্রুতি বা গৌণফলের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।শাস্ত্রের এরূপ তাৎপর্য নয় যে, তারা গৌণফলে সন্তুষ্ট থাকুক। শাস্ত্রে তাৎপর্য এই যে গৌণফল দেখে আকৃষ্ট হলে স্বল্পকালের মধ্যেই সাধুকৃপায় মুখফলের পরিচয় ও ক্রমে রুচি হবে। যেমন—একাদশী ব্রত পালনে পাপনাশ।

৮। স্মৃতিশাস্ত্র কি ? স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের বিচার কি ?

উঃ) বেদ ও তদনুগত শাস্ত্রসমূহকে স্মৃতিপথে রেখে মনু, অত্রি, পরাশর আদি ঋষিগণ দেহাত্মবুদ্ধি বিশিষ্ট সংসারী জীবকুলকে সামাজিক সুষ্টুভাবে জীবনযাপনের জন্য নানবিধ বিধি-নিষেধমূলক সূত্র বা নিয়ম রচনা করেছেন, তা স্মৃতিশাস্ত্র নামে পরিচিত।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর সমসাময়িক যুগের বাঙালি শাস্ত্রজ্ঞ স্মার্ত্ত পণ্ডিত ছিলেন ও বিখ্যাত লেখক ছিলেন। বহ্বায়নবাদি (বহু দেবদেবীর উপাসক) সকাম বর্ণাশ্রম ধর্মালম্বী হিন্দুদের ধর্মীয় ও সামাজিক বিধিবিধান সম্পর্কে তিনি যা আলোচনা করেছেন, সেই শাস্ত্র রঘুনন্দনের স্মৃতিশাস্ত্র নামে পরিচিত। বর্ণাশ্রমী আর্যদিগের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে দশবিধ সংস্কার দেখা যায় তাতে স্মার্ত্ত বিচারের প্রাবল্য অধিক। আর শ্রৌক্রব্রাহ্মণগণের এতে একচেটিয়া অধিকার।

স্মার্ত্তমতের বিচারগুলি নিম্নলিখিত—

ক) বহুদেবদেবীর উপাসনার বিধান রয়েছে।

খ) বিষ্ণুর সেবার বিচার দেখা গেলেও কর্মাধীন দেবতারূপে বিষ্ণুকে স্থাপন করা হয়েছে।

গ) বেদোক্ত কর্মকাণ্ডে জড়তাপ্রাপ্ত হওয়া তথা শাস্ত্রে ভোগপ্রদানকারী ফলশ্রুতিমূলক বাক্যে সম্মোহিত থাকার বিচার পরিলক্ষিত হয়।

ঘ) ইহাতে শ্রৌক্র বংশগত পরম্পরায় বর্ণাশ্রম ধর্ম বিচারই মুল। গুণগত বা সংস্কারগত লক্ষণ নাই।

ঙ) জাগতিক সুখ ভোগের বিচারকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

৯। মুক্তির বাস্তবস্বরূপ বর্ণন করুন ? (পুরানো বই—৪৯ পৃঃ)

উঃ) গৌতমের ন্যায়শাস্ত্র মতে—"অত্যন্তদুঃখনিবৃত্তিরেব মুক্তিঃ" অর্থাৎ আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তির নাম মুক্তি। কিন্তু ন্যায় শাস্ত্রের মতে জীব ও ব্রহ্মে নিত্য ভেদ রয়েছে। ফলে দেহগত সুখ-দুঃখ পৃথক, ন্যায়ের মতে দুঃখের নিবৃত্তেরই নাম মুক্তি বলা হয়েছে। অপরপক্ষে শঙ্করাচার্যের বেদান্তমতে অভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানকে মুক্তি বলা হয়েছে। এই বিচারে জীবের আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি সম্ভব। অন্যদিকে শ্রীধর স্বামী মতে " অথ মুক্তিহিত্বা অন্যথারূপং স্বরূপেন ব্যবস্থিতি।" অর্থাৎ বহির্মুখ ভাব পরিত্যাগ পূর্বক স্বরূপে ব্যবস্থিতির নাম প্রকৃত মুক্তি। অন্যভাবে বলা যায় যে, জীবের স্রষ্টা ও প্রভুর অংশ রূপে নিজ স্বরূপের অনুভূতিই যথার্থমুক্তি বা পরম মুক্তি।

OO

১০। শঙ্করের শারীরক ভাষ্য কি ?

উঃ) বেদব্যাস কৃত ব্রহ্মসূত্রকে কেহ কেহ শারীরক সূত্র বলেন। শরীর অধিষ্ঠিত জীব বা শরীরভব সুখ-দুঃখ—শারীরক নামে পরিচিত। তৎ সম্বন্ধীয় সংক্ষিপ্ত সার সূত্রসমূহই শারীরক সূত্র অর্থাৎ যে গ্রন্থে সংক্ষেপে জীবের অধিষ্ঠানভূত শরীরের বা তদুত্থিত সুখ-দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি বিষয়ক মীমাংসা আছে। ইহা শারীরক সূত্র নামে খ্যাত।

বেদব্যাস কৃত ব্রহ্মসূত্রের উপর কেবলাদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্যের কল্পনাপ্রসূয়ে বিরচিত শারীরক ভাষ্য বা সূত্র। মায়াবাদীগণ শঙ্করাচার্যের শারীরক উদ্দিষ্ট শাস্ত্রকে বেদান্ত বলেন। তাঁরা কৃষ্ণভক্তিকে কর্মানুষ্ঠান বলিয়া জানেন। কারণ ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত ব্যাখ্যায় নির্বিশেষ ব্রহ্মমত স্থাপনের জন্য শঙ্করাচার্য এরূপ প্রয়াস করায়, উহা নিতান্ত শুদ্ধভক্তিবিরুদ্ধ কুমতবাদ মাত্র। সুতরাং শুদ্ধবৈষ্ণবদের এই ভাষ্য শ্রবণ করা উচিত নয়। এই সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

বৈষ্ণব হঞা যেবা শারীরক ভাষ্য শুনে।
সেব্য-সেবক ভাব ছাড়ি আপনারে ঈশ্বর মানে ।। (চৈঃ চঃ অঃ—২।৯৫)

১১। মুসলিম ধর্মে জীবাত্মার নিত্যত্ব ও শুদ্ধ ভক্তি বা প্রেমের কথা রয়েছে কি ? (পুরানো বই—৫৩ পৃঃ)

উঃ) মুসলিম ধর্মে জীবাত্মার নিত্যত্ব ও শুদ্ধভক্তি বা প্রেমের কথা রয়েছে। কিন্তু তা মুখ্য তাৎপর্য থাকায় সকলের বোধগম্য হয় না। মুসলিম ধর্মে জীবাত্মা 'রু' বলে পরিচিত। এই 'রু' দুই অবস্থায় 'রু-মুজর্‌রদী' ও 'রু-তর্‌কীবী' নামে পরিচিত। এর মধ্যে মুজরদী হলো দেশ-কালের অতীত শুদ্ধ জীবাত্মা যা নিত্য। 'আলম মিশাল' নামক চিন্ময় ভূমিতে এই মুজরদী জীবাত্মা অবস্থান করে। মুসলিম ধর্মে 'এস্ক' বলে যে শব্দ শুনতে পাওয়া যায় উহাই ভক্তি বা প্রেম। তর্‌কিবি রু অর্থাৎ বদ্ধজীব এস্ক অর্থাৎ প্রেম সমৃদ্ধিক্রমে মুজর্‌রদী রু অর্থাৎ শুদ্ধ হয়। তখন পয়গম্বর সাহেব ঐ মুজর্‌রদী রুকে সঙ্গে নিয়ে যান "আলম মিসাল' নামে চিন্ময় ভূমিতে। সেখানে খোদা অর্থাৎ ভগবান ও বান্দা অর্থাৎ দাসের নিত্য সম্বন্ধ নিত্য বর্তমান।

১২। সংসার বলতে কি বোঝায় ? কৃষ্ণের সংসার থেকে উহার ভেদ কোথায়?

উঃ) শুদ্ধবস্থায় জীবের নিত্য কৃষ্ণদাস অভিমান। বদ্ধাবস্থায় কৃষ্ণের ছায়াশক্তি মায়া তার সত্ত্ব, রজ ও তমগুণে বহির্মুখ জীবকে আবদ্ধ করায় জীব সংসারে প্রবেশ পূর্বক আমি মানুষ, আমি দেবতা, আমি পশু, আমি রাজা, আমি ব্রাহ্মণ, আমি পণ্ডিত, আমি মূর্খ, আমি ধনী, আমি দরিদ্র আদি এবং আমার সম্বন্ধে আমিত্বে যে অভিমান অর্থাৎ আমার গৃহ, আমার স্ত্রী, আমার পতি, আমার কন্যা, আমার পিতা, আমার মাতা, আমার সম্পত্তি আদি মমত্ব অভিমান করে। এই আমি ও আমার অর্থাৎ 'অহং', 'মম' ভাব নিয়ে যে একটি প্রকাণ্ড ব্যাপার চলছে তার নাম সংসার।

১। 'অহং', ও 'মম' অভিমানে মায়ার সংসার এবং ভগবানকে উদ্দেশ্য করে 'তুমি' ও 'তোমার' সম্বন্ধে কৃষ্ণের সংসার।

২। মায়ার সংসারে শাঠ্য বিদ্যমান এবং কৃষ্ণের সংসারে কোনপ্রকার শাঠ্য নাই, সম্পূর্ণ সরলতা বিদ্যমান।

৩। মায়ার সংসার বিদ্ধ বর্ণাশ্রম ধর্মযুক্ত এবং কৃষ্ণের সংসার শুদ্ধ বা দৈব-বর্ণাশ্রম ধর্মযুক্ত।

১৩। গৃহী ও ত্যাগী ভক্তের লক্ষণ ও অধিকার বর্ণন করুন। (পুরানো বই—৮৪ পৃঃ)

উঃ) **গৃহী ভক্তের লক্ষণ ও অধিকার—**

ক) স্ত্রী বা দার গ্রহণকরেছেন। খ) জীবে দয়া, কৃষ্ণনাম ও বৈষ্ণব সেবন মহোৎসবময় তাঁদের জীবন। গ) তাঁরা অনাসক্ত হয়ে বিষয়কে স্বীকার করেন। ঘ) তাঁদের আশা, ক্রিয়া, আতিথ্য, দেবসেবা সমস্তই কৃষ্ণসেবার অধীন। ঙ) নিরপেক্ষময় তাঁদের জীবন। চ) সংসারের ব্যবহারিক জীবনের আচরণকে তাঁরা ভজন অনুকূলে স্বীকার

করেন। ছ) ত্বদীয় সম্বন্ধ অভিমান প্রবল। জ) অকুটীল ও সদ্ধর্ম্ম পিপাসু। ঝ) তিনি কৃষ্ণের সংসারের অভিমান।

ত্যাগী ভক্তের লক্ষণ ও অধিকার—ক) স্ত্রী-সঙ্গ স্পৃহা শূন্যতা। খ) সর্বজীবে পূর্ণ দয়া। গ) অর্থ ব্যবহারে তুচ্ছ জ্ঞান। ঘ) কেবল গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহকালে অভাববোধে যত্ন। ঙ) কৃষ্ণে সুদ্ধ রতি। চ) বহির্মুখ সঙ্গে তুচ্ছ জ্ঞান। ছ) জীবনে মরণে রাগ-দ্বেষশূন্য। জ) বহু আড়ম্বর শূন্য ঝ) মান-অপমানে সমবুদ্ধি ঘ) সুখ-দুঃখে সমভাব সম্পন্ন।

১৪। বৈষ্ণব ধর্মের উদারতা কোথায় ? (পুরানো বই—৮৮ পৃঃ)

উঃ) ক) বৈষ্ণব ধর্ম বড় উদার, ইহার নাম জৈবধর্ম।সকল শ্রেণীর মানব এই বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করতে পারে। 'চণ্ডাল অপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়নঃ''। বর্ণাশ্রম বহির্ভূত মানুষ (অন্ত্যজ, শূদ্র, চণ্ডাল), খৃষ্টান, মুসলমান, মূর্খ আদি সমাজে যে কোন শ্রেণীর লোক আত্মধর্মে জাগ্রত হয়ে বৈষ্ণব ধর্ম যাজন করতে পারেন।

খ) বর্ণাশ্রমের মধ্যে সন্ন্যাস ভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ বা কোন অপকর্মীও পরে সাধুসঙ্গে শুদ্ধভক্তি লাভ করে গৃহী ভক্ত হতে পারেন, তাদের কোন বর্ণাশ্রম নাই। সর্ববর্ণ বা অথবা বর্ণাশ্রম ধর্ম থেকে পতিত ব্যক্তিও বৈষ্ণব হতে পারেন।

খ) বৈষ্ণব ধর্ম যাজনের কোন স্থান, কাল পাত্রের বিচার নেই।

'কি ভোজনে কি শয়নে কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে ।। (চৈঃ ভাঃ মঃ—২৮।২৮)

গ) 'নির্মৎসরাণাং সতাং অর্থাৎ বৈষ্ণব ধর্ম নির্মৎসর সাধুগণের বৃত্তি। অতএব হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা কোন স্থান বৈষ্ণব ধর্মে নেই।

ঘ) বৈষ্ণব ধর্ম আত্মধর্ম। সুতরাং দেহ-দৈহিক কোন ব্যাপার নেই।

১৫। বৈষ্ণব কয়প্রকার ও পরস্পর ব্যবহার ভেদ বর্ণন করুন ? (পুরানো বই—১৪-১০১ পৃঃ)

উঃ) বৈষ্ণব তিন প্রকার। যথা—কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম।

কনিষ্ঠ বৈষ্ণব—শ্রীমদ্ভাগবত বলেন (ভাঃ—১১।২।৪৭)—

''অর্চ্চয়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধযে অতে ।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃত স্মৃতঃ ।।

অর্থাৎ যারা লৌকিক শ্রদ্ধার সহিত বিষ্ণুমন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ পূর্বক শ্রীমূর্ত্তি পূজা করেন কিন্তু কৃষ্ণ ভক্তদের শ্রদ্ধা-পূর্বক পূজা করেন না, তিনি কনিষ্ঠ বৈষ্ণব। এটা প্রাথিমিক ভক্তির দ্বার কিন্তু শুদ্ধভক্তি নয়। এঁরা ক্রমে মধ্যম ও উত্তম হতে পারেন।

মধ্যম বৈষ্ণব—শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—(ভাঃ—১১।২।৪৬)

''ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যম ।।

অর্থাৎ যাঁরা সর্বেশ্বরেশ্বর কৃষ্ণে প্রেম, তদধীন ভক্তে মৈত্রী, মূর্খে কৃপা এবং ভগবদ্বিদ্বেষী জনে উপেক্ষা করেন তিনি মধ্যম বৈষ্ণব।

উত্তম বৈষ্ণব—শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—(ভাঃ—১১।২।৪৫)—

''সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগববদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ।।

অর্থাৎ যিনি সর্বভূতে ভগবানের সম্বন্ধজনিত প্রেমময় ভাব এবং সর্ববভূতের সম্বন্ধজনিত প্রেমময় ভাব ভগবানে উপলব্ধি করেন, তিনি উত্তম বৈষ্ণব। এক প্রেমবই আর অন্য কোন ভাব উত্তম বৈষ্ণবের হয় না।যদি কোন অন্য ভাব দেখা যায় তাহলে বুঝতে সেটা প্রেমের বিকার মাত্র।

১৬। প্রাকৃত বিজ্ঞান ও চিৎ বিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য কি ? (পুরানো বই—১১৬-১১৭)

উঃ) বিজ্ঞান শব্দের অর্থ বিশেষ জ্ঞান। কোন বস্তুর যথার্থ উপলব্ধিকে জ্ঞান বা বিজ্ঞান বলে। সেই জ্ঞান দুই প্রকার। যথা—বিষয় বা প্রাকৃতবিজ্ঞান ও শুদ্ধ বা চিৎবিজ্ঞান।

১। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকে প্রাকৃতবিজ্ঞান বলে এবং চিৎতত্ত্ব আশ্রয়ে যে জ্ঞান তা চিৎবিজ্ঞান।

২। জড়প্রবৃত্তি অনুসারে প্রাকৃত বিজ্ঞানের উন্নতিসাধিত হয় অপরদিকে চিৎপ্রবৃত্তি বা চিন্ময় অনুশীলনের দ্বারা চিৎবিজ্ঞান অনুভূত হয়।

৩। ধনুর্বিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, জ্যোতিষবিদ্যা আদি প্রাকৃত বিজ্ঞান। ঈশ্বর, জীব ও মায়া পরস্পরের

নিত্য সম্বন্ধজ্ঞান চিৎবিজ্ঞান।

৪। প্রাকৃত বিজ্ঞান দেহ, মন সম্বন্ধীয় এবং চিৎবিজ্ঞান আত্মসম্বন্ধীয়।

৫। বদ্ধদশার সুষ্ঠু জীবনযাত্রার জন্য প্রাকৃত বিজ্ঞান এবং বৈষ্ণবদের ভজনের ভিত্তিমূল ও নিত্য চিৎবিজ্ঞান।

১৭। প্রাকৃত সভ্যতা ও বৈষ্ণব সদাচার এর মধ্যে পার্থক্য কি ?(পুরানো বই—১১৪ পৃঃ)

উঃ) ১। সরলতা বিহীন যে ভদ্রতা তার নাম প্রাকৃত সভ্যতা এবং সত্যপথে সরল হৃদয়ে জীবন-যাপন করার নাম বৈষ্ণব সদাচার।

২। প্রাকৃত সভ্যতার অন্তরালে পাপাচার থাকতে পারে কিন্তু যখন সরলতা যুক্ত নিষ্পাপ ভাব তারই বৈষ্ণব সদাচার।

৩। প্রাকৃত সভ্যতায় লোকরঞ্জনের ও স্বার্থসিদ্ধির প্রাবল্য দেখা যায় এবং বৈষ্ণব সদাচারে কেবল জীবের প্রতি প্রকৃত দয়া ও ভগবৎ তোষণের প্রাধান্য রয়েছে।

১৮। বৈষ্ণব কি শাক্ত—এই বিষয়ে ব্যাখ্যা করুন ? (পুরাণো বই—১১৯ পৃঃ)

উঃ) বৈষ্ণবগণ হলেন প্রকৃত বা শুদ্ধশাক্ত। তাঁরা চিৎশক্তি স্বরূপিণী শ্রীরাধিকার অধীন। তাঁর আশ্রয়েই বৈষ্ণবদের শ্রীকৃষ্ণভজন অর্থাৎ শক্তির আশ্রয়ে শক্তিমানের আরাধনা। সুতরাং বৈষ্ণবদের তুল্য আর শাক্ত কে আছে? চিৎশক্তিকে আশ্রয় না করে মায়াশক্তিতে যাদের রতি অথচ শক্তিমানে আরাধনা শূন্য তারা বিদ্ধশাক্ত ও কেবল বিষয়ী। শ্রীনারদপাঞ্চরাত্রে দুর্গাদেবী বলেছেন—'তব বক্ষসি রাধা অয়ং রাসে বৃন্দাবনে বনে'—অর্থাৎ বৃন্দাবনে আমি চিৎস্বরূপে অন্তরঙ্গাশক্তি শ্রীরাধিকারূপে তোমার বক্ষবিলাসিনী। দুর্গাদেবীর এই বাক্য থেকে জানা যায় যে, শক্তি দুই নন। একই শক্তি চিৎস্বরূপে রাধিকা ও জড়স্বরূপে জড়শক্তি। বিষ্ণুমায়া নির্গুণ অবস্থায় চিৎশক্ত ও সগুণ অবস্থায় জড়শক্তি।

১৯। বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাস লিখুন ? (পুরানো বই—১২৯ পৃঃ)

উঃ) সৃষ্টির আদিকাল হতে বৈষ্ণবধর্ম বিদ্যমান ছিল। সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্মা ছিলেন বৈষ্ণব, তারপর মহাদেব, প্রজাপতিগণ সকলেই বৈষ্ণব। ব্রহ্মার মানস পুত্র নারদ তিনিও বৈষ্ণব ছিলেন। দৈত্যকুলে আমরা প্রহ্লাদ মহারাজ, বলি মহারাজকে পাই। ধ্রুব মহারাজও বৈষ্ণব ছিলেন। ইতিহাসে প্রারম্ভিক কালেও চন্দ্র ও সূর্যবংশীয় রাজাগণ বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ ব্যক্তি ও মুনিগণ ছিলেন। কলিযুগেও চার বৈষ্ণব আচার্য শ্রীরামানুজাচার্য, শ্রীমধবাচার্য, শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও নিম্বার্ক ছিলেন যাঁদের প্রভাবে বহু মানুষ বৈষ্ণব ধর্ম যাজন করে বিষ্ণুভক্তি লাভ করেছিলেন। এঁনাদের পরবর্ত্তীকালে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু এসে বৈষ্ণবধর্মকে আরো প্রস্ফুটিত করে তুললেন। দীন-হীন পতিত সকলকে প্রেমবন্যায় ভাসিয়ে দিলেন। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অনুগ হয়ে ষড়গোস্বামী এবং তৎপরবর্ত্তী বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, বলদেব বিদ্যাভূষণ, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ, বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের মাধ্যমে ঐ বৈষ্ণব ধর্ম প্রবাহিত ছিল। এঁনাদের পরবর্ত্তী শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল প্রভুপাদ আদি গৌড়ীয় গুরুবর্গের ধারার প্রকট আচার্য পর্যন্ত সেই সনাতন বৈষ্ণব ধর্মকে প্রবাহিত করে চলেছেন।

২০। মহাপ্রভুর আবির্ভাবে বৈষ্ণব ধর্মের কিরূপ বিকাশ ঘটেছিল ? (পুরানো বই—১৩০ পৃঃ)

উঃ) ক) শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমনের পূর্বে বৈষ্ণব ধর্মে কিছুটা জাতি-বর্ণের ভেদাভেদ ছিল। যেমন একমাত্র ব্রাহ্মণদের বেদপাঠের অধিকার ছিল। কিন্তু মহাপ্রভু তাঁর আনীত বৈষ্ণবধর্মকে সম্পূর্ণভাবে জাত-পাতের ঊর্দ্ধে রেখেছেন।

খ) মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে বৈষ্ণব ধর্মে বৈধী ভক্তির প্রচার ছিল, মহাপ্রভুর বৈষ্ণব ধর্মে রাগানুগা ভক্তির প্রচার করেছেন।

গ) ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেম যা কিনা উন্নতউজ্জ্বলরস বা বিপ্রলম্ভ রসের পরাকাষ্ঠা স্বরূপ ব্রজেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু সেই রসকে এ জগতে মহাপ্রভু প্রকাশ করেছেন।

ঘ) পরতত্ত্ব স্বরূপ ভগবৎ তত্ত্বের পরাকাষ্ঠা ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা যা কলিযুগের জীবের সাধন ও সাধ্য বস্তু, তিনি দান করেছেন।

ঙ) কলিযুগের যুগধর্ম নামসংকীর্ত্তন। ইহা শ্রীশচীনন্দন শ্রীগৌরহরির অবদান।

চ) শিক্ষাষ্টকে নামসংকীর্ত্তনের অধিকার সম্বন্ধে মহাপ্রভু দৈন্য, দয়া, অন্যে মান ও প্রতিষ্ঠা বর্জন—এই চারটি গুণের অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন অর্থাৎ তৃণাদপি সুনীচেন এই মহৎবাণী তাঁরই সৃষ্টি।

২১। পশুবধ বিষযে শাস্ত্রের বিচার কি লিখুন ? (পুরানো বই—১৩৪ পৃঃ)

উঃ) পশুহত্যা শাস্ত্রের তাৎপর্য নয়। "মা হিংস্যাৎসর্বাণি ভূতানি"—বেদের এই বাক্য দ্বারা পশুহত্যার নিষেধ করা

হয়েছে। গৌণবৃত্তিতে পশুহত্যার কথা বলা হয়েছে, মুখ্যবৃত্তিতে নয়। বেদের আজ্ঞা না মেনে তামসিক ও রাজসিক ভাবাপন্ন ব্যক্তিরা স্ত্রী সঙ্গলিপ্সা, আমিষ ভোজন ও সুরা পানে রত থাকে। এরূপ আসুরিক ভাবাপন্ন ব্যক্তিদের তামসিক ও রাজসিক বৃত্তিকে খর্ব করবার জন্য বিবাহের দ্বারা স্ত্রী-সঙ্গ, যজ্ঞে পশুহত্যা ও বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াতে সুরাপানের বিধান করা হয়েছে। প্রবৃত্তিমার্গ (ভোগবাদ) হতে নিবৃত্তিমার্গে (ত্যাগবাদে) আনবার জন্য বেদের এরূপ গৌণবিধান। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা নিত্যাস্তু জন্তোর্নহি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞসুরাগ্রহৈরাশুনিবৃত্তিরিষ্টা ।। (ভাঃ—১১।৫।১১)

অর্থাৎ ইহলোকে স্ত্রী-সঙ্গ, মাছ-মাংস ভোজন ও মদ্যপান স্পৃহা জীবের নৈসর্গিক,—তাতে শাস্ত্রের কোন আদেশ বা প্রেরণা নাই। সেই সকল প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করবার জন্য বিবাহের দ্বারা স্ত্রী-সঙ্গ, যজ্ঞ বিশেষ আমিষভোজন এবং সুরাগ্রহণ ব্যবস্থিত হয়েছে। অতএব নিবৃত্তিই বেদের গূঢ় তাৎপর্য।

মনু বাক্যে বলা হয়েছে—"প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা" অর্থাৎ প্রাণীগণের প্রবৃত্তি মার্গ হতে নিবৃত্তিমার্গই মহাফলজনক।

২২। পৌত্তলিকতা ও বৈষ্ণবদের বিগ্রহ সেবার মধ্যে পার্থক্য লিখুন ? (পুরানো বই—১৪০ পৃঃ)

উঃ) ক) পৌত্তলিকতা কথার অর্থ পুতুল পূজা। বিশেষরূপে সেবা গ্রহণ করেন যিনি বিগ্রহ।

খ) পৌত্তলিক পূজায় আবাহন ও বিসর্জন আছে কিন্তু বৈষ্ণবের বিগ্রহ সেবায় আবাহন ও বিসর্জন নেই।

গ) পৌত্তলিক পূজা জড়ীয় কিন্তু বিগ্রহ চিন্ময়।

ঘ) পৌত্তলিকতা বাহ্যিক আড়ম্বরের প্রাধান্য রয়েছে কিন্তু বিগ্রহ সেবায় অন্তর নিষ্ঠার প্রাধান্য রয়েছে।

ঘ) পৌত্তলিক পূজায় সকাম উপাসনার কথা রয়েছে। বিগ্রহ সেবায় চিদ্ অনুশীলনের কথা রয়েছে। "প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।"

ঙ) পৌত্তলিক মানবের কল্পনাপ্রসূত মূর্ত্তি অপরদিকে বিগ্রহ মহাজনদের হৃদয়ের অনুভবের দ্বারা প্রকটিত।

চ) পৌত্তলিক পূজা সর্বদা মানবের নিজ ইন্দ্রিয়চরিতার্থ মূলে আরাধিত কিন্তু বিগ্রহ উচ্চাধিকারের নিকট চিন্ময়, মধ্যমাধিকারের নিকট মনোময় ও নিম্নাধিকারের নিকট জড়ময় মনে হলেও ক্রমশঃ হৃদয়ে ভাব শোধিত হলে চিন্ময়ত্বের উপলব্ধি হয়।

২৩। সাধ্য ও সাধন বিষয়ে মহাপ্রভুর বিচার লিখুন ? (পুরানো বই—১৫৪ পৃঃ)

উঃ) শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভাষায়—যে কার্যকে উদ্দেশ করে, তাই সাধ্য এবং যে কার্যের দ্বারা তা সাধিত হয়, তাই সাধন। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু জীবগণকে গূঢ়রূপে 'শিক্ষাষ্টক' নামে যে আটটি শ্লোক দিয়েছেন, তা ভক্তগণের মণিহার স্বরূপ। তাতে সাধ্য-সাধন বিষয়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাত্মক শিক্ষা রয়েছে। প্রথম পাঁচটি শ্লোকে অভিধেয় মূলে সম্বন্ধ-জ্ঞানের শিক্ষা। আটটি শ্লোকই অভিধেয় এবং শেষ তিনটি শ্লোকে প্রয়োজন বিষয়ক শিক্ষা পাওয়া যায়। প্রথম পাঁচটি শ্লোকে অধিধেয় বিচারে "সাধন ভক্তি", পরের দুইটি শ্লোকে অভিধেয় বিচারে 'ভাবভক্তি' এবং ষষ্ঠ হতে অষ্টম শ্লোকে বিশেষতঃ সপ্তম ও অষ্টম শ্লোকে সাধ্য 'প্রেমভক্তি' দেখানো হয়েছে। মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের সেই গূঢ়ভাব বিচার করে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যে "দশমূল শিক্ষা" রচনা করেছেন তাতে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন বিচারে সাধ্য-সাধন সূত্ররূপে কথিত হয়েছে।